Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ

বাংলাদেশ স্টাডিজ

Subject Code | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |

Marks Distribution

☐ **ইনকোর্স পরীক্ষা ও উপস্থিতি : মান– ২০**

ক. ইনকোর্স পরীক্ষা ১৫

খ. উপস্থিতি ৫

☐ **সমাপনী পরীক্ষা : মান– ৮০**

ক. রচনামূলক প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ১৫ × ৪ = ৬০

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ৫ × ৪ = ২০

সর্বমোট = ১০০

Exclusive Suggestions

مجموعة (الف)

ক. রচনামূলক প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– [১৫ × ৪ = ৬০]

		সম্ভাবনার হার
١.	ما هى حركة اللغة؟ تحدث عن دور حركة اللغة فى استقلال بنغلاديش۔	৭৭%
	[ভাষা আন্দোলন কী? বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা আলোচনা কর।]	
٢.	اذكر الثروات الطبيعية والمعدنية لبنغلاديش۔ ثم تحدث عن اهميتها فى الاقتصاد الوطنى ۔	৭৭%
	[বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের বিবরণ দাও। অতঃপর জাতীয় অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।]	
٣.	عرف الدستور۔ ثم بين الحقوق الأساسية المذكورة فى دستور بنغلاديش۔	৭৭%
	[সংবিধানের সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা কর।]	
٤.	اكتب أسماء أشهر الأنهار فى بنغلاديش۔ ثم بين دور الأنهار فى التنمية الاقتصادية لبنغلاديش۔	৭৭%
	[বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ নদীসমূহের নাম লেখ। অতঃপর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীসমূহের ভূমিকা আলোচনা কর।]	
٥.	ما هى الصناعات المشهورة فى بنغلاديش؟ تحدث عن الماضى الذهبى لصناعة جوت ومستقبلها المأمول۔	৭৭%
	[বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ শিল্পগুলো কী কী? পাট শিল্পের সোনালী অতীত ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা কর।]	
٦.	بين مساهمة الشيخ شاه جلال اليمانى (رحـ) فى نشر الإسلام ببنغلاديش۔	৭৭%
	[বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে হজরত শাহজালাল ইয়ামেনী (র)-এর অবদান বর্ণনা কর।]	

مجموعة (ب)

সম্ভাবনার হার

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– [৫ × ৪ = ২০]

৯৯% ৭. تحدث عن دور صناعة الملابس الجاهزة فى التنمية الاقتصادية لبنغلاديش باختصار۔

[বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক শিল্পের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোকপাত কর।]

৯৯% ৮. اذكر أبرز انجازات الحكومة فى حل النقل البرى موجزا ۔

[সড়ক ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ কর।]

৯৯% ৯. بين الموقع الجغرافى والحدود لدولة بنغلاديش ۔

[বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানার বর্ণনা দাও।]

৯৯% ১০. بين تاريخ المدرسة العالية الحكومية بداكا بإيجاز۔

[সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া-ঢাকা এর ইতিহাস বর্ণনা কর।]

৯৯% ১১. بين القبائل والشعوب الأصلية لبنغلاديش ۔

[বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী সম্পর্কে ধারণা দাও।]

৯৯% ১২. عرف بعض الأنهار المشهورة فى بنغلاديش ۔

[বাংলাদেশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নদীর পরিচয় দাও।]

৯৯% ১৩. اكتب فقرة وجيزة حول الكثافة السكانية فى بنغلاديش ۔

[বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লেখ।]

Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ

বাংলাদেশ স্টাডিজ

Solution to Exclusive Suggestions

مجموعة (الف)

(الف) অংশ

■ **السؤال (١)** : ما هى حركة اللغة؟ تحدث عن دور حركة اللغة فى استقلال بنغلاديش.

■ **প্রশ্ন : ১ ॥ ভাষা আন্দোলন কী? বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা আলোচনা কর।**

উত্তর ।। **ভূমিকা :** ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত আন্দোলনের দিন। বাঙালির গৌরব ও বেদনার ইতিহাস এর সাথে জড়িত রয়েছে। বাঙালিকে বুকের রক্ত দিতে হয়েছিল নিজের মাতৃভাষার যথার্থ মর্যাদা আদায়ের জন্য, তাই এ দিনটি বেদনার রক্তে রঙিন হয়েছিল। আবার ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পথে বাঙালি তার ভাষার স্বীকৃতি অর্জনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে বলে এটি আমাদের জাতীয় জীবনে একান্ত গৌরবেরও। আর '৫২-র ভাষা আন্দোলনই আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার যুগান্তকারী পদক্ষেপ। যার ফলশ্রুতিতে বলতে হয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

➲ ভাষা আন্দোলন

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবিতে সংগঠিত ছাত্রজনতার আন্দোলনকে বলে ভাষা আন্দোলন। অন্যভাবে বলা যায়, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানের দাবিতে ১৯৫২ সালে পরিচালিত আন্দোলনকে ভাষা আন্দোলন বলা হয়। বাঙালিদের প্রাণের দাবি ছিল এটি এবং এ আন্দোলনে অনেক তাজা প্রাণ রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. হারুন অর-রশিদ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বলেন, "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার যে উদ্যোগ গৃহীত হয়, তার বিরোধিতা করে বাংলা ভাষাকে উর্দুর পাশাপাশি পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে গড়ে ওঠা বাঙালিদের যে আন্দোলন তাই ভাষা আন্দোলন।"

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি গণআন্দোলনে কয়েকজন ছাত্র-জনতা শহীদ হন এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে অবশেষে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অবদান এ আন্দোলনে স্মরণীয় হয়ে আছে। অতএব, ভাষা আন্দোলন বলতে দুর্বার গণআন্দোলনকে বুঝায়। বাঙালিরা যে আন্দোলনে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতির দাবি উত্থাপন করে এবং এ দাবি আন্দোলনের মুখে সফল হয়।

➲ বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা

বাঙালিরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার বঞ্চিত ছিল বলে সকল শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত করেছিল, তার প্রথম সোপান ছিল ভাষা আন্দোলন। সুতরাং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। নিম্নে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা আলোচনা করা হলো–

১. **নব জাতীয় চেতনা জাগ্রত :** পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নব জাতীয় চেতনা তথা বাঙালি জাতির মনে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে। ফলে বাঙালিরা স্বাধীনতা সংগ্রামে আন্দোলন করার অনুপ্রেরণা পায়।

২. **সাহস ও প্রেরণার উৎস :** এদেশের বুদ্ধিজীবীদেরকে ভাষা আন্দোলন জনগণের সাথে একাত্ম করে তোলে এবং সমগ্র জাতিকে সংগ্রামী চেতনায় আন্দোলিত করে। যার ফলে বাঙালির মধ্যে যে বৈপ্লবিক চেতনা ও সংহতিবোধের সৃষ্টি হয়, তা পরবর্তী পর্যায়ের সকল আন্দোলনে প্রাণশক্তি, সাহস ও প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে।

৩. **গণদাবি আদায়ের শিক্ষা লাভ :** সর্বপ্রথম রক্তের বিনিময়ে ভাষা আন্দোলনই জাতীয়তাবাদী গণদাবি আদায়ের শিক্ষা ও প্রেরণা দান করে। বাঙালি জাতি এ দৃষ্টান্ত হতে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মতো দুর্জয় সংকল্প, সাহস ও অনুপ্রেরণায় আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে।

৪. **বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ :** ভাষা আন্দোলনে অতি দৃঢ়ভাবে বাঙালি জাতীয়তার ঐক্যসূত্র গৃহীত হয়। বাঙালিরা একই জাতিসত্তায় বাঁধা– ভাষা আন্দোলনে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। ভাষা আন্দোলন তাই বাঙালির জাতীয়তাবাদ বিকাশের অন্যতম উপাদান। আর বাঙালি এই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েই স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

৫. **হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি স্থাপন :** ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন। বাংলা ভাষার জন্য এ আন্দোলনে এদেশের আপামর জনগণ অংশগ্রহণ করে। ফলে পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। যা স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

৬. **অধিকার সচেতনতাবোধ জাগ্রত :** বাঙালির অধিকার সচেতনতাবোধ ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে জাগ্রত হয়। বাঙালি জাতি এর মধ্য দিয়ে অন্যায়, অত্যাচার ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের শিক্ষালাভ করে।

৭. **জাতীয় সংহতি ও একাত্মবোধ সৃষ্টি :** সকল স্তরের বাঙালির মধ্যে ভাষা আন্দোলন জাতীয় সংহতি ও একাত্মবোধের সৃষ্টি করে। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে শুধু ছাত্রজনতাই নয়, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী শ্রেণিও এক কাতারে শামিল হয়ে আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে।

৮. **যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ :** '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে রক্তদানের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে চেতনা বিকশিত হয়, সে চেতনা থেকেই যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়েছিল এবং ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক পরিষদে যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে চরমভাবে পরাজিত করে।

৯. **রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণ :** পূর্ববাংলার প্রভাবশালী অংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই রাজনীতিতে ব্যাপক অংশগ্রহণ শুরু হয় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণি রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে।

১০. **শহিদ মিনার স্থাপন :** ভাষা আন্দোলনের কারণে বাংলার শহর ও গ্রামে অসংখ্য শহিদ মিনার নির্মিত হয় এবং প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হওয়ার ফলে বাঙালি অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে।

১১. **ভবিষ্যৎ আন্দোলনের প্রামাণ্য চিত্র :** সমগ্র বাঙালি জাতি ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা পায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৫২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের অসহযোগ আন্দোলন মূলত ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

১২. **স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা :** ভাষা আন্দোলনের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার বীজ নিহিত ছিল। বাঙালি এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই ধাপে ধাপে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়।

১৩. **রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন :** তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ ভাষা আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। আন্দোলনের ফলে বাঙালিরা উপলব্ধি করল যে, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী হিসেবে অন্য সকল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ অধিকার আছে। আর বাঙালিরা এ রাজনৈতিক সচেতনতাবোধের কারণেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে বিজয় অর্জন করে।

১৪. **গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা বৃদ্ধি :** গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম অবদান। বাঙালি জনসাধারণ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। এর আসল প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় এবং মুসলিম লীগের ভরাডুবিতে। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা গণতান্ত্রিক কর্মসূচিকে জনসাধারণ বিপুলভাবে সমর্থন করে এবং ভাষা আন্দোলন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি আস্থা জাগায়। বাঙালিকে এ আস্থাই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভ ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

১৫. **ঐক্যবদ্ধ জাতি :** দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে জাতীয় সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়। ছাত্র, জনতা, কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী সবাই একই কাতারে যুক্ত হয়। যা বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

১৬. **সাংস্কৃতিক আন্দোলন :** পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে থেকেই বাংলাভিত্তিক বাংলা ভাষা চর্চা ছিল; কিন্তু ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ফলে ঢাকা ভিত্তিক একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। আর এরাই স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

১৭. **১৯৬২ সালের শিক্ষা কমিশন :** ১৯৬২ সালে গঠিত শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শরু হয় তাতে ১৯৫২ সালের চেতনা যথেষ্টভাবে কাজ করেছে।

১৮. **অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ :** রাষ্ট্র গঠনে ধর্মই একমাত্র কারণ হতে পরে না এটা প্রমাণিত হলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ঐ আন্দোলনে সমর্থন দেয়। অসাম্প্রদায়িক ও সেক্যুলার রাজনীতি বিকাশ লাভ করে ঐ আন্দোলনের ফলে। আর এটিই ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯. **রাজনৈতিক নেতাদের মনোভাব :** যে উৎসাহ নিয়ে রাজনৈতিক নেতারা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়েছিল ১৯৫২ সালে এসে সেই মোহ ভেঙে যায়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এরই ধারাবাহিকতায় মুলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে।

২০. **স্বাধীনতা লাভ :** ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাঙালি অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে। এরপর ক্রমান্বয়ে তারা নিজেদের অধিকার ও প্রাপ্য আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনের মনোভাব নিয়ে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয় ঘটায়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ তথা জাতীয়তাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। এ আন্দোলন প্রক্রিয়া ভাষা আন্দোলনরূপে সূত্রপাত হলেও এর রাজনৈতিক প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলনের পর থেকেই বাঙালি ধাপে ধাপে সামগ্রিক স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয় এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিতে সক্ষম হয়। তাই বলা হয় ভাষা আন্দোলনের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল।

■ **السؤال (٢)** : اذكر الثروات الطبيعية والمعدنية لبنغلاديش - ثم تحدث عن اهميتها فى الاقتصاد الوطنى -

■ প্রশ্ন : ২ ॥ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের বিবরণ দাও। অতঃপর জাতীয় অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ **ভূমিকা :** পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের সম্পদ বিদ্যমান রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্পদকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন প্রকার খনিজ সম্পদ যেমন– প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, চীনামাটি প্রভৃতি, সম্পদ প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

➲ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের বিবরণ

নিচে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো–

১. **মাটি :** মাটি বাংলাদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। এদেশের সমতল ভূমি খুবই উর্বর। বেশির ভাগ এলাকায় বছরে তিনটি ফসল উৎপন্ন হয়। দেশের ১০ ভাগের এক ভাগ অঞ্চল পাহাড়ি এলাকা। পাহাড়ে প্রচুর প্রাণিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদ রয়েছে।

২. **বনজ সম্পদ :** বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২৪,৯৩৮ বর্গকিলোমিটার। দেশের মোট ভূ-ভাগের ১৬ ভাগ হচ্ছে বন। বনে রয়েছে মূল্যবান গাছপালা। এগুলো আমাদের ঘরবাড়ি ও আসবাব তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বনে রয়েছে পাখি ও প্রাণীসম্পদ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনে গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের আরও বেশি অর্থাৎ ২৫% বনভূমি থাকা প্রয়োজন।

৩. **প্রাণীসম্পদ :** আমাদের প্রাণীসম্পদের মধ্যে রয়েছে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি প্রভৃতি। এগুলো গৃহপালিত প্রাণী। এছাড়াও রয়েছে নানা প্রজাতির পাখি।

৪. **প্রাকৃতিক গ্যাস :** বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ একটি দেশ। ১৯১০ সালে এ দেশে অনুসন্ধানমূলক কূপ খনন করা হয়। ১৯৫৫ সালে সিলেটে সর্বপ্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২ অনুসারে এই পর্যন্ত দেশে মোট ২৮টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ২৮টি গ্যাস ক্ষেত্রের মোট প্রাক্কলিত মজুতের পরিমাণ ৩৯.৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য মজুতের পরিমাণ ২৮.৪২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২২-এর তথ্য অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৯.১১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জানুয়ারি ২০২২ এ উত্তোলনযোগ্য নিট মজুতের পরিমাণ ৯.৩০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সার উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, গৃহস্থালি জ্বালানি ও অন্যান্য শিল্পে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

৫. **খনিজ তেল :** খনিজ তেল হলো পেট্রোলিয়ামের তরল রূপ, যা ভারী হাইড্রোকার্বন যৌগসমূহের সমষ্টি। বাংলাদেশে এখনও উল্লেখযোগ্য কোনো তেল খনি আবিষ্কৃত হয়নি। ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে সর্বপ্রথম একটিমাত্র তেল খনি পাওয়া গিয়েছে। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত হরিপুরের তেল খনি হতে ৬.৫ লক্ষ ব্যারেল তেল উত্তোলন করা হয়েছে। বর্তমানে ঐ খনি হতে তেল উত্তোলন বন্ধ রয়েছে। তবে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে খনিজ তেল সঞ্চিত আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

৬. **চুনাপাথর :** সিমেন্ট, গ্লাস, কাগজ, সাবান, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি শিল্পে ও গৃহ নির্মাণে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া রং ও ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রস্তুতেও চুনাপাথর কাজে লাগে। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে চুনাপাথর সঞ্চিত আছে। সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট, চারগাঁ, লালঘাট, ভাঙ্গারহাট ও বাগলি বাজারে চুনাপাথরের খনি আছে। এ সমস্ত খনিতে প্রায় ৪.৫ কোটি মেট্রিক টন চুনাপাথর সঞ্চিত আছে। এখান থেকে ছাতকের সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে চুনাপাথর সরবরাহ করা হয়। এছাড়া জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জে ১০ কোটি মেট্রিক টন চুনাপাথর সঞ্চিত আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তদুপরি, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড ও বঙ্গোপসাগরের সেন্টমার্টিন দ্বীপেও চুনাপাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদেশে বছরে গড়ে প্রায় ৪০ হাজার মেট্রিক টন চুনাপাথর উত্তোলন করা হয়।

৭. **কয়লা :** কয়লা সাধারণত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া, রংপুর জেলার খালাসপীর, জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ ও দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি ও দিঘীপাড়ায় কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি থেকে ইতোমধ্যে কয়লা উত্তোলন হচ্ছে দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আবিষ্কৃত মোট ৫টি কয়লা ক্ষেত্রের (রংপুরের খালাসপীর, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ি ও দীঘিপাড়া এবং জয়পুরহাটের (জামালগঞ্জ) মজুদ প্রায় ৭,৯৬২ মিলিয়ন টন।

৮. **সিলিকা বালি :** কাচ তৈরিতে সিলিকা বালি কাজে লাগে। বাংলাদেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, জামালপুর ও কুমিল্লা জেলায় সিলিকা বালি পাওয়া যায়। হবিগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং জামালপুর জেলার বালিজুড়িতে প্রায় ২ লক্ষ মেট্রিক টন সিলিকা বালি সঞ্চিত আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এছাড়া কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন সিলিকা বালি সঞ্চিত আছে।

৯. **শক্ত পাথর বা কঠিন শিলা :** রেল লাইন, বাঁধ নির্মাণ ও রাস্তাঘাট তৈরি করতে শক্ত পাথরের প্রয়োজন হয়। রংপুর ও দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শক্ত পাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৯৬৬ সালে রংপুর জেলার রানীপুকুর এলাকায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া রানীপুকুরের প্রায় ৩২ কিলোমিটার দক্ষিণে দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া নামক স্থানেও ১৯৭৪ সালে অনুরূপ শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। এ শিলা খনির আয়তন ১.২ বর্গ কিলোমিটার, যা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় ১৯৯৪ সালের ২০ অক্টোবর।

১০. আণবিক খনিজ পদার্থ : কক্সবাজার ও টেকনাফের সমুদ্র সৈকতে এবং কুতুবদিয়া ও মহেশখালী দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে মোনাজাইট, মেগনেটাইট, ইলমেনাইট প্রভৃতি আণবিক খনিজ পদার্থ পাওয়া গিয়েছে। এ সমস্ত আণবিক খনিজ পদার্থ কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশ সরকার একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করেছে। অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশকে এই প্রকল্পে সহায়তা দানের আশ্বাস দিয়েছে।

১১. তামা : বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, মুদ্রা, বাসনপত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করতে তামার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। রংপুর জেলার রানীপুকুর ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ার কঠিন শিলার স্তরে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে।

১২. নুড়ি পাথর : প্রধানত রাস্তাঘাট ও গৃহ নির্মাণে নুড়ি পাথর ব্যবহৃত হয়। সুনামগঞ্জ জেলার ভোলাগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জ, পঞ্চগড়ের সদর উপজেলায়, লালমনিরহাটের পাটগ্রাম এবং সিলেটের তামাবিল অঞ্চলে নুড়ি পাথর পাওয়া যায়।

১৩. চীনামাটি : চীনামাটি এক ধরনের উন্নতমানের সাদা রঙের কাদা, যার প্রধান উপাদান হলো কেয়োলিনাইট। সিরামিক শিল্পে চীনামাটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ১৯৫৭ সালে নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুরে চীনামাটি স্তরের আবিষ্কার ঘটে। এছাড়া নওগাঁর পত্নীতলা, দিনাজপুরের মধ্যপাড়া, বড়পুকুরিয়া, দীঘিপাড়া এবং জয়পুহাটের পাঁচবিবিতে চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে।

১৪. লবণ : প্রাকৃতিক সম্পদ লবণ শুধু আহার্য হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না, এটি বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনেও কাজে লাগে। কসটিক সোডা ও ঔষধ প্রস্তুতেও লবণ অত্যাবশ্যক। চামড়া পাকাকরণ ও খাদ্য সংরক্ষণেও প্রচুর লবণের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে এখনও লবণ খনি আবিষ্কৃত হয়নি। তবে নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে সমুদ্রের পানি থেকে লবণ প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৭৫ লক্ষ কুইন্টাল লবণ উৎপাদন করা হয়।

➲ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের গুরুত্ব

নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের প্রভাব আলোচনা করা হলো–

১. অর্থনীতির কাঠামো : বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কৃষি আমাদের জাতীয় আয়েরও প্রধান উৎস। বাংলাদেশের দেশজ উৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কৃষিখাত থেকে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষির উপর এরূপ নির্ভরশীলতার পেছনে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অবদান রয়েছে। বাংলাদেশের পলিগঠিত সমতল উর্বর জমিতে অল্প খরচে ফসল উৎপাদন করা যায়। ফলে এদেশের মানুষ কৃষিকেই প্রধান উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

২. শিল্পোন্নয়ন : আমাদের শিল্পোন্নয়নও প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রথমত আমাদের শিল্পোন্নয়ন প্রাথমিক পর্যায়ে কতিপয় কৃষি পণ্যের উপর ভিত্তি করে যাত্রা শুরু করেছে। পাট ও ইক্ষু আমাদের প্রধান অর্থকরী ফসল। তাই এদেশে পাট ও চিনি শিল্পের প্রসার ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, পশু মাংস এদেশের মানুষের প্রিয় খাদ্য। গবাদি পশু থেকে প্রতিবছর আমরা প্রচুর চামড়া পাই। এ সমস্ত পশু চামড়ার উপর ভিত্তি করে আমাদের ট্যানারী শিল্প গড়ে উঠেছে। তৃতীয়ত, বাংলাদেশ একটি অতি জনবহুল দেশ। ফলে শ্রম খুবই সহজলভ্য। তাই এদেশে শ্রম-প্রগাঢ় শিল্প গড়ে উঠেছে। সস্তা শ্রমের কারণেই আমাদের পোশাক শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে সাফল্য লাভ করেছে।

৩. শক্তি সম্পদ : শক্তি সম্পদ অর্থনৈতিক তথা শিল্পোন্নয়নের ভিত্তি। বাংলাদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। তাই গ্যাস ব্যবহার করে আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। তাছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও গ্যাসকে তেলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। তদুপরি, প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর ভিত্তি করে দেশে কয়েকটি সার কারখানা স্থাপিত হয়েছে।

৪. যাতায়াত ব্যবস্থা : আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনে পরিবহণ ও যোগাযোগের অবদান প্রায় ১১.১৩ শতাংশ। আমাদের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকাংশে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২১,৫৬৯ কি.মি. সড়ক রয়েছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে সারা বছর ৩,৮০০ কিলোমিটার জলপথ থাকে। বর্ষাকালে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৬০০০ কিলোমিটারে উন্নীত হয়। বাংলাদেশে ছোট বড় বহু নদ-নদী আছে এবং এর সবগুলোই নাব্য। ফলে এদেশের যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থায় জলপথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. মৎস্য উৎপাদন : বাংলাদেশের নদ-নদী, খাল-বিল ও হাওড়-বাঁওড়ে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মাছ ধরা ও মৎস্য ব্যবসায়ে এদেশের প্রচুর লোক নিয়োজিত আছে। মৎস্য খাত আমাদের কর্মসংস্থানের একটি অন্যতম উৎস। মৎস্য খাত আমাদের দেশজ উৎপাদনেও (GDP) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। মৎস্য রপ্তানি করেও বাংলাদেশ প্রচুর আয় উপার্জন করে। ২০২১-২২ অর্থবছরে আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনে মৎস্য খাতের অবদান ছিল ২.০৮ শতাংশ এবং সার্বিক কৃষিখাতে মৎস্য খাতের অবদান ২১.৮৩ শতাংশ।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে প্রয়োজনের তুলনায় খনিজ সম্পদ কম, তবে বাংলাদেশে যে বিপুল অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ রয়েছে সেগুলো আবিষ্কার, উত্তোলন এবং উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত হবে।

■ **السؤال (٣)** : عرف الدستور۔ ثم بين الحقوق الاساسية المذكورة فى دستور بنغلاديش۔

■ **প্রশ্ন : ৩ ॥ সংবিধানের সংজ্ঞা দাও। বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারসমূহ বর্ণনা কর।**

উত্তর ॥ ভূমিকা : বিশ্বের প্রতিটি দেশে জনগণের কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানেও এর ব্যতিক্রম করা হয়নি। তাছাড়া বাংলাদেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর বাংলাদেশের সংবিধানেও নাগরিকের মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬-৪৭ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারগুলোর উল্লেখ রয়েছে।

➲ সংবিধানের সংজ্ঞা

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় মৌলিক নিয়ম-কানুনের সমষ্টিকে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলে। অন্যভাবে বলা যায়, সংবিধান বা শাসনতন্ত্র হলো সেসব লিখিত ও অলিখিত মৌল বিধানাবলি, যা রাষ্ট্রের ক্ষমতার ব্যবহার ও বণ্টন রীতিকে প্রভাবিত করে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক নির্ণয় করে। সংবিধান হলো একটি রাষ্ট্রের দর্পণ বা প্রতিচ্ছবি। একটি রাষ্ট্রের গঠন কাঠামো কীরূপ হবে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন কীভাবে হবে, ব্যক্তি ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ হবে তা নির্ধারণ করে সংবিধান। অর্থাৎ সংবিধান হলো এমনই এক দর্পণ যার মধ্যে একটি জাতির সামগ্রিক রূপ মূর্ত হয়ে ওঠে।

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১. গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ **এরিস্টটল (Aristotle)**-এর মতে, "সংবিধান হলো এমন একটি জীবন পদ্ধতি যা রাষ্ট্র নিজেই বেছে নিয়েছে।"

২. **লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce)**-এর মতে, "যেসব আইন বা প্রথা রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনকে প্রভাবিত করে তার সমষ্টিকে সংবিধান বলে।"

৩. **কে. সি. হুইয়ার (K. C. Wheare)**-এর মতে, "সংবিধান হচ্ছে সেসব নিয়মের সমষ্টি যা কী উদ্দেশ্যে এবং কোন বিভাগের মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা পরিচালিত হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে।"

৪. **সি. এফ. স্ট্রং (C. F. Strong)**-এর মতে, "সংবিধান হচ্ছে সেসব নিয়ম-কানুনের সমষ্টি যা দ্বারা সরকারের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার এবং এ দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়ে থাকে।"

৫. **অধ্যাপক গেটেল (Gettell)**-এর মতে, "রাষ্ট্রের ধরন নির্ধারণের মৌলিক নিয়মাবলিই সংবিধান। এগুলো রাষ্ট্র সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতার বণ্টন এবং সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্কের নিয়মাবলি বর্ণনা করে।"

৬. **অধ্যাপক ডাইসি (Dicey)**-এর মতে, "প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যেসব নিয়ম-কানুন রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহারের ও বণ্টনের রীতিনীতিকে প্রভাবান্বিত করে তাই সংবিধান।"

৭. **আর.এন. গিলক্রিস্ট (R. N. Gilchrist)**-এর মতে, "সংবিধান হলো কতকগুলো লিখিত ও অলিখিত আইন বা নীতিমালার সমষ্টি, যা দ্বারা সরকারের সংগঠন, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন এবং সেসব সাধারণ মূলনীতিসমূহ নির্ধারিত হয়ে থাকে যার মাধ্যমে এসব ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়।"

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোর প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সংবিধান বা শাসনতন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্রের সেসব মৌলিক রীতিনীতি যা দ্বারা সরকারের গঠন কাঠামো, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্ষমতা এবং জনগণের উপর সরকারের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব নির্ধারিত হয়। প্রতিটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রই তার নিজস্ব সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং সংবিধান দেশে বিদ্যমান সকল আইনের উৎস হিসেবে কাজ করে।

➲ ১৯৭২ সালের সংবিধানে লিপিবদ্ধ মৌলিক অধিকারসমূহ

১৯৭২ সালের সংবিধানে লিপিবদ্ধ প্রধান মৌলিক অধিকারসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো–

১. **আইনের দৃষ্টিতে সমতা :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ২৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিক সমান অধিকার লাভের অধিকারী। আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আইন সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। আইন প্রয়োগের বেলায় কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না। সকল ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্রীয় আইন সমান আচরণ করবে এবং সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে। ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তির কর্ম ও দায়িত্বের ভিন্নতা থাকতে পারে এবং বিভিন্ন শ্রেণির কর্তব্য ও অধিকার ভিন্ন হতে পারে।

২. **ধর্মীয় স্বাধীনতা :** ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ২৮ ও ৪১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জনস্বার্থ ও নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন ও প্রচারের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকবে। অবশ্য এ অধিকার আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে। এছাড়া কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোনো ব্যক্তিকে নিজ ধর্ম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ বা ধমীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না।

৩. **সরকারি চাকরি লাভের অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ২৯নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন যে-কোনো নাগরিক সরকারি চাকরি লাভের অধিকারী। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী, নারী-পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে নাগরিকদের প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

৪. **বিদেশি রাষ্ট্রের উপাধি গ্রহণ :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির পূর্বঅনুমতি ব্যতীত কোনো নাগরিক কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নিকট হতে খেতাব, সম্মান বা পুরস্কার গ্রহণ করতে পারবে না।

৫. **আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল ব্যক্তি আইনানুসারে পরিচালিত হবেন। আইনের অনুমোদন ব্যতীত কারো জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি করা যাবে না।

৬. **জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা :** প্রত্যেকের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, আইনের অনুমোদন ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকবে।

৭. **গ্রেফতারের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদে গ্রেফতারের কারণ জানার এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিককে দেওয়া হয়েছে। তবে কোনো বিদেশি শত্রুর ব্যাপারে তা প্রযোজ্য হবে না।

৮. **জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো নাগরিককে বলপূর্বক শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না। সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ হবে এবং কোনোভাবে লঙ্ঘিত হলে তা আইনত দণ্ডনীয় বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য, সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীর ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

৯. **বিচার ও দণ্ড সংক্রান্ত অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, কোনো নাগরিককেই প্রচলিত আইন অমান্য করার অপরাধ ব্যতীত দোষী সাব্যস্ত করা এবং আইনে নির্ধারিত দণ্ড ছাড়া অতিরিক্ত দণ্ড দেওয়া যাবে না।

১০. **চলাফেরার অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত বিধি-বিধান সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের বাংলাদেশের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার রয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে যে-কোনো স্থানে বসবাস করতে পারবে এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও পুনঃপ্রবেশও করতে পারবে।

১১. **সমাবেশের অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও জনস্বার্থের খাতিরে আইনানুগ নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিক শান্তিপূর্ণভাবে জনসভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণের অধিকারী।

১২. **সংগঠনের অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সংগঠন করার অধিকার রয়েছে। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে কোনো সংগঠন করা যাবে না।

১৩. **বাক্‌স্বাধীনতা :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে নাগরিকদের চিন্তা, বিবেক ও বাক্‌স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংগঠনে প্ররোচনা সম্পর্কে রাষ্ট্র আইন দ্বারা যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারবে।

১৪. **পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৪০ অনুচ্ছেদ অনুসারে আইনের নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের যে-কোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের অধিকার রয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে আইনসংগত কারবার বা ব্যবসাও করতে পারবে।

১৫. **সম্পত্তির অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৪২ অনুচ্ছেদ অনুসারে সকল নাগরিকই আইনসম্মতভাবে সম্পত্তি অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর করতে পারবে। আইনের নির্দেশ ছাড়া নাগরিককে সম্পত্তিচ্যুত করা যাবে না।

১৬. **গৃহ নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার অধিকার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের সকল নাগরিক নিজ গৃহে নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। তাছাড়া প্রত্যেক নাগরিক তার চিঠিপত্র বা যোগাযোগের (রাষ্ট্রীয় স্বার্থবিরোধী নয়) গোপনীয়তার অধিকার লাভ করবে।

১৭. **মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রত্যেক নাগরিককে মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগের কাছে মামলা রুজু করার অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

১৮. **দায়মুক্তি বিধানের ক্ষমতা :** ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৪৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কোনো কিছু করে থাকলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করতে পারবে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করার কারণে এটি নিঃসন্দেহে একটা উত্তম সংবিধানের পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলো সন্নিবেশিত হওয়ার কারণে নাগরিকগণ নিজেদের কর্তব্য পালনে অনুপ্রাণিত হয়। জনগণ তাদের নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও নিশ্চিত থাকতে পারে, ফলে দেশের সরকার স্বৈরাচারী হতে পারে না। জনগণ উপলব্ধি করতে পারে ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। বাংলাদেশের সংবিধানের এসব মৌলিক অধিকারের মাধ্যমেই জনগণ তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। অতএব প্রতিটি নাগরিকের সংবিধানে উল্লিখিত এসব মৌলিক অধিকারগুলো সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

■ **السؤال (٤)** : اكتب أسماء أشهر الأنهار فى بنغلاديش - ثم بين دور الأنهار فى التنمية الاقتصادية لبنغلاديش -

■ **প্রশ্ন : ৪ ॥ বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ নদীসমূহের নাম লেখ। অতঃপর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীসমূহের ভূমিকা আলোচনা কর।**

উত্তর ।। ভূমিকা : নদীকে ঘিরেই বাংলাদেশের শহর, বন্দর, গঞ্জ, বাজার প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। নদী ও বাংলাদেশ একই সুতোয় গাঁথা দুটি নাম। এ দেশের মাটি ও মানুষের সাথে নদী ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। এ দেশের মালামাল পরিবহণ ও যোগাযোগের সহজ উপায় হলো নদী। বাংলাদেশকে বলা হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ, যার সৃষ্টি নদীবাহিত পলি জমাট বেঁধে। এসব নদী মাতৃভূমিকে করেছে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। তাই ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম।

➲ বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ নদীসমূহের নাম

বাংলাদেশের সবগুলো নদীর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা বেশ কঠিন। নদীর নামকরণের ক্ষেত্রে এ দেশে কোনো ধরনের নীতিমালা অনুসরণ করা হয় না। এখানে একই নদীকে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন নামে ডাকার প্রবণতা রয়েছে। এমনকি কোনো একটি নদীর মাত্র পাঁচ/ছয় কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের অংশকেও এর উজানের নামের থেকে ভিন্ন নামে ডাকা হয়। নদীটির নতুন নামকরণ কোনো স্থান থেকে শুরু হলো তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। আবার একই নামে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন নদীর অস্তিত্ব রয়েছে। বিশেষত দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের নদীগুলো এতোবেশি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত যে ভিন্ন ভিন্ন শাখা-প্রশাখাগুলোকে আলাদা নামে চিহ্নিত করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এ সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও দেশের প্রসিদ্ধ নদীগুলোর নামের একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো : ১. পদ্মা, ২. মেঘনা, ৩. যমুনা, ৪. আড়িয়াল খাঁ, ৫. ভৈরব, ৬. ব্রহ্মপুত্র, ৭. বুড়িগঙ্গা, ৮. চিত্রা, ৯. ডাকাতিয়া, ১০. ধলেশ্বরী, ১১. করতোয়া, ১২. গড়াই, ১৩. মধুমতি, ১৪. ঘাঘট, ১৫. আত্রাই, ১৬. কর্ণফুলি, ১৭. কপোতাক্ষ, ১৮. যমুনেশ্বরী, ১৯. কুশিয়ারা, ২০. ফেনী, ২১. মাতামুহুরী, ২২. পুনর্ভবা, ২৩. রূপসা, ২৪. পশুর, ২৫. সাজু, ২৬. সুরমা, ২৭. তিস্তা, ২৮. হালদা, ২৯. শীতলক্ষ্যা, ৩০. ধরলা, ৩১. মহানন্দ, ৩২. ইছামতী, ৩৩. বাঙ্গালি, ৩৪. তুরাগ, ৩৫. তিতাস, ৩৬. গোমতী, ৩৭. গড়াই, ৩৮. চিত্রা, ৩৯. কীর্তনখোলা, ৪০. ভদ্রা ইত্যাদি।

➲ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীসমূহের ভূমিকা

নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নদীসমূহের ভূমিকা বা গুরুত্ব আলোচনা করা হলো–

১. **কৃষির উন্নয়ন :** কৃষিখাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের চাষাবাদ নদীনালার পানির ওপর নির্ভরশীল। কেননা আমন ধান কাটার পর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে বীজতলা তৈরি করে ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধে বোরো ধান রোপণ করা হয়। এ সময় বোরো মৌসুমে বৃষ্টি তেমন হয় না বিধায় জমি চাষ করা থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত জোয়ারের সময় নদীর পানি দিয়ে সেচ প্রদান করা হয়। সারাদেশে জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য নদী বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যা দেশের কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২. **শিল্পের উন্নয়ন :** দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতির একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। শিল্প অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। দেশজ উৎপাদনে এ খাতের অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের শিল্প কারখানাগুলো বিভিন্নভাবে নদীর পানি ব্যবহার করে। যেমন– পানীয় তৈরিতে, স্টিল মিল ঠাণ্ডা রাখতে, সিমেন্ট, কাপড় ও কাগজ প্রভৃতি তৈরিতে নদীর পানি ব্যবহৃত হয়। এছাড়া নদীপথে কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য পরিবহণে খরচ কম হওয়ায় বাংলাদেশের অধিকাংশ বড় বড় শিল্পকারখানা নদীতীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে। এভাবে নদী দেশের শিল্পের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

৩. **মৎস্য সম্পদ :** বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম নদীবাহিত বদ্বীপ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। নদীমাতৃক এ দেশটি স্মরণাতীতকাল থেকে মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধশালী। দেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ মৎস্য সম্পদ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর অগ্রগতি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আর জীবনধারণ ও বাণিজ্যিক উদ্যোগের দিক থেকে মৎস্য সম্পদের জন্য নদীর গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যবহ।

৪. **নৌচলাচল ও পরিবহণ :** সভ্যতার ইতিহাসে স্থলযানের আগে আবিষ্কৃত হয়েছে জলযান। নদীনালা বেয়ে মানুষ ভ্রমণ করেছে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। প্রথমে খাদ্যের প্রয়োজনে, পরে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সামাজিক প্রয়োজনে। নদী পরিবহণ সবচেয়ে সস্তা ও সহজ। বাংলাদেশে নদী পরিবহণ দীর্ঘদিন ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম ও মংলায় দুটি সমুদ্রবন্দর রয়েছে। যে বন্দর দুটি দিয়ে শতভাগ আমদানি-রপ্তানি হয়ে থাকে। এছাড়া নদী পথে পরিবহণ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার, পরিবহণ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৫. **পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন :** পানি শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনে। পাহাড়ি জায়গায় উঁচু থেকে নীচুতে প্রবাহিত পানির এ গতি শক্তিকে কাজে লাগিয়েই উৎপন্ন হয় পানি বিদ্যুৎ। পাহাড়ি উঁচু জায়গায় নির্মিত জলাধার থেকে নিম্নমুখী জলের সাহায্যে টারবাইন ঘোরানো হয়। টারবাইনের সাহায্যে জেনারেটর ঘুরলে বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি হয়। পার্বত্য এলাকায় স্বাভাবিক জলাশয়কেও কাজে লাগানো হয়। বাংলাদেশে একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্ণফুলি নদীতে অবস্থিত যা কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নামে পরিচিত। এ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৯৬২ সালে। বাংলাদেশের পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা খুব সীমিত হলেও ছোট ছোট ড্যাম ও ব্যারেজ এলাকায় ক্ষুদ্র পানি বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. **সুন্দরবনকে রক্ষা :** বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা সুন্দরবনের চারদিকে ঘিরে রয়েছে নদী ও খাল। নদীর পানির প্রবাহের ওপর সুন্দরবনের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সুন্দরবনের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কেননা এ বন থেকে টুকরা কাঠ, জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, বেত ও মধু সংগ্রহ করা হয়। এ বন একটি বড় জনগোষ্ঠীর জন্য স্থানীয় কর্মসংস্থান যোগায়। এ বনের মধ্যে ও পাশে অবস্থিত নদীপথগুলো মাছ প্রাপ্তির দিক দিয়েও সমৃদ্ধ। এখানকার জেলেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে।

৭. **পরিবেশ ও জলবায়ু রক্ষা :** নদী দেশের বিচ্ছিন্ন কোনো অংশ নয় বরং দেশের পরিবেশের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নদীর সাথে আবহাওয়া ও জলবায়ুর সম্পর্ক গভীর। বিশ্ব উষ্ণায়নের একটি সম্ভাব্য পরিণতি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্লাবিত এলাকার পরিমাণও বেড়ে যাবে, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হবে, প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহ হ্রাস পাবে এবং নদীর ক্ষীণ প্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনা পানি সহজেই দেশের অভ্যন্তরীণ নদীপ্রবাহে প্রবেশ করে নদীর পানির লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। কাজেই বাংলাদেশের ভরাট হওয়া, মৃতপ্রায় নদীগুলোকে খনন করে জলবায়ু পরিবর্তনের এ মারাত্মক প্রভাব থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে। এছাড়া বাংলাদেশের নদীগুলো দিয়ে মিঠা পানি প্রবাহিত হয়। পৃথিবীতে মিঠা পানির পরিমাণ খুবই কম। যাও আছে তার বেশিরভাগই এশিয়ায় অবস্থিত। এদিক দিয়েও বাংলাদেশের নদীগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষয়রোধ, সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নে নদীর অর্থনৈতিক গুরুত্ব তাৎপর্যবহ।

৮. **জীববৈচিত্র্য রক্ষা :** নদী কেবল মানুষের স্বার্থেই কাজ করে না বরং এর সাথে জড়িয়ে আছে হাজার হাজার পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় প্রভৃতির জীবন। কেননা নদী মরে গেলে বা শুকিয়ে গেলে নদীর পাশে অবস্থিত বন, জঙ্গালের বিলুপ্তি ঘটবে। ফলে দুর্লভ প্রাণী ও কীটপতঙ্গ চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ধ্বংস হবে এ দেশের জীববৈচিত্র্য। কাজেই জীববৈচিত্র্য রক্ষায় নদীর ভূমিকা অপরিসীম।

৯. **আর্সেনিকমুক্ত পানি :** নদীই বাংলাদেশের জীবন, বাংলাদেশের সবুজ শ্যামল সৌন্দর্যের একমাত্র বাহক ও নিয়ন্ত্রক। ঐতিহাসিককাল থেকে মানুষ নদীর পানি ফুটিয়ে পান করে আসছে; কিন্তু পরবর্তীতে নলকূপ আসায় মানুষ নলকূপের মাধ্যমে পানি ব্যবহার ও পান করতে থাকে। তবে গত দেড় দশকেরও অধিক সময় বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এ দেশের ৬৪টি জেলার ৬০টি জেলাই কম-বেশি আর্সেনিকে আক্রান্ত। এদিক দিয়ে বাংলাদেশের নদীর পানি আর্সেনিকমুক্ত, স্বচ্ছ ও নিরাপদ। নদীপাড়ের অনেক মানুষ এখনও নদীর পানি দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহার করে জীবন পরিচালনা করছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ঐতিহাসিককাল থেকেই বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা নদী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। এ দেশের নদীগুলো সেচকাজে অপরিহার্য, উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক, মাছের যোগান দাত্রী, আমদানি-রপ্তানি, পরিবহণ ও যাতায়াতের অন্যতম রুট হিসেবে অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ নদীগুলো কমপক্ষে ত্রিশ হাজার মাঝিমাল্লার খাদ্য সংস্থান করছে। এ ছাড়াও এ দেশের গ্রামীণ মানুষের জীবন জীবিকা অতীতে ছিল নদীনির্ভর, এখনো তা অব্যাহত রয়েছে। নদী ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। কারণ নদীকে ঘিরেই মানুষ মাছ ধরে, মালামাল স্থানান্তরিত করে সড়কপথের সাথে সংযুক্ত করে। সুতরাং নদী বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নে বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করে থাকে।

■ **السؤال (٥) :** ما هى الصناعات المشهورة فى بنغلاديش؟ تحدث عن الماضى الذهبى لصناعة جوت ومستقبلها المأمول.

■ **প্রশ্ন : ৫ ॥ বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ শিল্পগুলো কী কী? পাট শিল্পের সোনালী অতীত ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা কর।**

উত্তর ॥ ভূমিকা : একটি দেশের আধুনিক অর্থনীতির মূলভিত্তি হচ্ছে শিল্প। শিল্প এমন একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করা হয়। দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করার কাজটি কোনো ফার্ম বা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকে। এরূপ সমজাতীয় ফার্ম বা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে শিল্প গঠিত হয়। যেমন বাংলাদেশের সকল পাট কলের সমন্বয়ে পাট শিল্প এবং সকল চিনি তৈরির কলের সমন্বয়ে চিনি শিল্প গঠিত হয়েছে।

➲ বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ শিল্পসমূহ

বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ শিল্পগুলো হলো–

১. **পাট শিল্প :** বাংলাদেশে কৃষিনির্ভর শিল্পগুলোর মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম। এ দেশে পর্যাপ্ত ও উৎকৃষ্ট পাট চাষ হওয়ায় কাঁচামালের সহজলভ্যতা পাঠ শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করছে। বর্তমানে দেশের সবচেয়ে বড় পাটকল আদমজী পাটকলটি বন্ধ রয়েছে, তবে বেসরকারিভাবে অনেক পাটকল গড়ে উঠেছে।

২. **বস্ত্র শিল্প :** কার্পাস বয়নশিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। মানুষের খাদ্যের পরই বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাই বস্ত্র শিল্পের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এ দেশের আবহাওয়া বস্ত্র শিল্পের অনুকূল নয়। তাই বিদেশ থেকে আমদানিকৃত তুলা ও সুতা দিয়ে বাংলাদেশের সুতা ও বস্ত্রকলগুলো পরিচালিত হয়।

৩. **কাগজ শিল্প :** কাগজ শিল্প বাংলাদেশের একটি অন্যতম বৃহৎ শিল্প। ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশের চন্দ্রঘোনায় প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারিভাবে ৬টি কাগজকল, ৪টি বোর্ড মিলস ও ১টি নিউজপ্রিন্ট কারখানা আছে। এছাড়া বেসরকারিভাবেও কিছু কাগজকল গড়ে উঠেছে।

৪. **সার শিল্প :** বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত ফসল। আর এজন্য প্রয়োজন সার। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ১৭টি সার কারখানা থেকে সার উৎপাদন হচ্ছে।

৫. **পোশাক শিল্প :** বাংলাদেশের পোশাক শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। সত্তর দশকের শেষে এবং আশির দশকের প্রথম থেকে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। এরপর এ শিল্প অতিদ্রুত বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের শীর্ষে নিজের স্থান করে নেয়। বর্তমানে দেশে অনেকগুলো রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। পোশাক শিল্পকে এখন বলা হয় 'বিলিয়ন ডলার' শিল্প।

৬. **পর্যটন শিল্প :** বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ একটি দেশ। তাই বাংলাদেশের প্রতিটি স্থানেই পর্যটনের আকর্ষণীয় উপাদান রয়েছে। যা এ দেশের পর্যটন শিল্পের জন্য বিরাট সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। বাংলাদেশ পর্যটনকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় শিল্পনীতিতে একে অগ্রাধিকার শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৭. **চা শিল্প :** চা শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম চা উৎপাদনকারী দেশ। বর্তমানে দেশে মোট ১৬৬টি চা বাগান আছে। প্রতিবছর যথেষ্ট পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় চা রপ্তানির মাধ্যমে। আমাদের দেশের বৃহত্তর সিলেটের পাহাড়িয়া অঞ্চল ও চট্টগ্রামের কিছু কিছু এলাকা চা চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

৮. **চামড়া শিল্প :** চামড়া শিল্প বাংলাদেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভাবনাময় একটি শিল্প। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চামড়া শিল্প পঞ্চম স্থানের অধিকারী। তাই এদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে চামড়া শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

➲ বাংলাদেশের পাট শিল্পের সোনালী অতীত

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় পাট উৎপাদিত হত; কিন্তু ১৮৮৫ সালের পূর্বে স্থানীয় তন্তরায় শ্রেণি দরিদ্র জনগণের জন্য মোটা বস্ত্র তৈরি করত। পাটভিত্তিক শিল্প স্থাপনের অনুপ্রেরণা আসে স্কটল্যান্ডের ডান্ডি থেকে। ১৮৮৫ সালে জর্জ অকল্যান্ড একজন বাঙালি অংশীদার (শ্যামসুন্দর সেন) নিয়ে কলকাতার হুগলি নদী তীরবর্তী রিশড়া নামক স্থানে প্রথম পাটকল স্থাপন করেন। এভাবে প্রথম যখন বাংলায় পাটকল স্থাপিত হয় তখন ডান্ডির মিলগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাদের পণ্যের জন্য নতুন বাজারের সন্ধান করছিল; কিন্তু কলকাতার মিলগুলি প্রতিষ্ঠার পরে থেকেই দ্রুত অগ্রগতি সাধন করে। ১৯০১ সালে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার সুতা কাটার টাকু, ১৫ হাজার তাঁত, ১লক্ষ ১০ হাজার শ্রমিক এবং ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে মিলের সংখ্যা ৩৫-এ উন্নীত হয়। এখানে উৎপাদিত ৮৫% পাটজাত দ্রব্য অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়। এভাবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাট শিল্প উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পে পরিণত হয় এবং কলকাতা বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হয়।

বিশ শতকের প্রথম তিন দশক থেকে পাট শিল্পের অভাবিত উন্নতি সাধিত হয়। ১৯০৩-০৪ সালে পাটকলের সংখ্যা ছিল ৩৮টি; কিন্তু ১৯২৯-৩০ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে ৯৮টিতে উন্নীত হয়। উৎপাদনের দিক থেকে স্থাপিত তাঁতের সংখ্যা ৩ গুণ বেড়ে যায় এবং এই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ১,২৩,৬৮৯ থেকে ৩,৪৩,২৫৭ জনে উন্নীত হয়। এর মূল কারণ ছিল বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে উচ্চ মুনাফা। বিশ্ববাজারে পাটজাত দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

১৯২০-২১ এবং ১৯২৯-৩০ সালের মধ্যে প্রায় ২১টি পাটকল স্থাপিত হয় এবং ১৯৩০ সালের মধ্যে মোট তাঁতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪০০০-এ উন্নীত হয়। এর পাশাপাশি সপ্তাহে কর্ম-সময় ৫৪ ঘণ্টা থেকে ৬০ ঘণ্টায় বৃদ্ধি পায়। পাটশিল্প যখন অতিরিক্ত উৎপাদন করার ক্ষমতা অর্জন করে তখনই বিশ্ব অর্থনীতিতে মহামন্দা দেখা দেয়। তবে মন্দার সময় নতুন পাটকল প্রতিষ্ঠার হার যেখানে কমে গিয়েছিল পরিবর্তিত অবস্থায় তা বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে প্রদেশে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৮.৪ হাজার তাঁতসহ ১১১টি।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশে এবং বিদেশে কাঁচাপাটের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে বাংলায় পাটচাষের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৮৪৫-১৮৫০ সালে পাটচাষের জমির পরিমাণ যেখানে ছিল ১৯ হাজার একর সেখানে ১৯০১-০২ সালে সেই জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২ কোটি ৯০ লক্ষ একরে উন্নতি হয়। পরবর্তী বছরগুলিতে অবশ্য পাটচাষের পরিমাণ কমে যায়; কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৪৫ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি একরে। কাঁচাপাট উৎপাদনের একচেটিয়া এলাকা বাংলা হলেও অধিকাংশ পাটচাষ হতো প্রদেশের পূর্ব অংশে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর স্থানীয়ভাবে কাঁচাপাটের প্রাপ্যতা, পাটজাত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে অতিরিক্ত উচ্চমূল্য এবং উদ্বৃত্ত শ্রমিক নিয়োগের সম্ভাবনা ইত্যাদি কারণে পাকিস্তানে নিজস্ব পাটশিল্প বিকাশের বিষয়টি অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু রপ্তানি বাণিজ্যের অনিশ্চয়তার বিষয়টি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় এবং এরূপ অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়েও পাকিস্তানের প্রথম পাটকল বাওয়া জুট মিলস লিমিটেড ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি সময়ে তাদের উৎপাদন শুরু করে। দ্বিতীয় মিলটি ভিক্টোরি জুট প্রডাক্টস লিমিটেড একই বছরের শেষের দিকে উৎপাদন শুরু করে। এগুলি ছিল বেসরকারি খাতের। একই বছর উৎপাদন শুরু করা তৃতীয় মিলটি ছিল নারায়ণগঞ্জের আদমজি জুট মিলস। এ মিলটি পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (২০০২ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ সরকার আদমজি জুট মিল বন্ধ ঘোষণা করে।) নারায়ণগঞ্জের পাশাপাশি খুলনার খালিশপুর ও দৌলতপুর হয়ে ওঠে পাট শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র। পাট চাষের পরিসর বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও অন্যতম ক্ষেত্রে পরিণত হয় এসব পাটকল। এভাবে সরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের মধ্যকার সক্রিয় সহযোগিতায় শিল্প বিকাশের পথ সুগম হয় এবং ১৯৬০ সাল নাগাদ ১৪টি মিলের মধ্যে ১২টি মিল পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে এই ১৪টি মিলের কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৫৭০০, তাঁতের সংখ্যা ছিল ৭৭৩৫টি এবং পাটজাত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২,৬০,৩৯৩ ম্যাট্রিক টন। পরবর্তী দশকে পাটশিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটে এবং ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে কিঞ্চিতধিক ২৫ হাজার তাঁতসহ মোট পাটকলের সংখ্যা ছিল ৭৭টি এবং এগুলির কাঁচাপাট

ব্যবহার করার ক্ষমতা ছিল ৩৪ লক্ষ বেল। ঐ বছরই সকল পাটকলে কর্মচারী সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ সত্তর হাজার এবং বিশ্বের ১২০টি দেশে পাটজাত দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করে ৭৭ কোটি টাকা আয় করা হয়। এভাবে পূর্ব পাকিস্তান পাটজাত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানির শীর্ষ দেশে পরিণত হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে পাকিস্তানের অর্জিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার মাত্র ০.২% ছিল পাটজাত দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি থেকে। ১৯৬৯-৭০ সালে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৬%।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় বাংলাদেশে পাটকলের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৮টি এবং লুমের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩,৭৮১টি। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানিদের কলগুলোকে শত্রুসম্পত্তি হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ১৯৮২ সালে সরকার পুনরায় বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি গ্রহণ করে। ফলে ব্যক্তিগত মালিকানায় যেতে শুরু করে। বর্তমানে পাটকলগুলোও রাষ্ট্রীয়/সরকারি মালিকানায় এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় রয়েছে। এমনকি ইদানীং অনেক নতুন নতুন পাটকল স্থাপিত হচ্ছে।

➲ বাংলাদেশের পাট শিল্পের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত

বাংলাদেশের পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। এর কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১. সমগ্র বিশ্বে প্যাকেজিং সামগ্রীর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাটজাত দ্রব্যের পর্দার কাপড়, জায়নামায, উল, রেশম, লিনোলিয়াম প্যাকেজিং দ্রব্য ছাড়াও বর্তমানে কার্পেট, ক্যানবাস, ত্রিপল প্রভৃতি বিভিন্নমুখী এবং মানসম্পন্ন দ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যমে এদেশের পাটের পূর্বের বাজার অক্ষুণ্ন রাখার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে। যা এ খাতের সম্ভাবনাকে আরো এগিয়ে দিয়েছে।

২. সম্প্রতি সবুজ পাট থেকে কাগজ ও রেয়ন তৈরির যে মতো উদ্ভাবন করা হয়েছে, বিশ্বের সর্বত্র এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

৩. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচলিত পাটজাত পণ্যের চাহিদা ও মূল্য হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ইতোমধ্যেই পাটজাত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৪. দেশে উৎপাদিত কাঁচা পাটের সিংহভাগ বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের পাটকলসমূহে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের পাটকলগুলো সারাদেশে স্থাপিত পাট ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে কাঁচা পাট ক্রয় করে পাটচাষিদের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে। বর্তমানে বিজেএমসির আওতাধীন মোট মিলের সংখ্যা ২৭। পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন হওয়ায় বাংলাদেশে পাটের উৎপাদন আরো বাড়বে।

৫. পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত পাট পাতা থেকে চা ইতোমধ্যেই বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। বিজেএমসি এই চা শিল্পকে বেগবান করতে জামালপুরের সরিষাবাড়িতে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাট পাতা হতে চা উৎপাদনের একটি কারখানা নির্মাণ প্রকল্প শুরু করেছে।

৬. বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম পাটের জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন করেছেন। এছাড়া পাটের জন্য ক্ষতিকর ছত্রাক 'ম্যাক্রোফমিনা ফ্যাসিওলিনা'র জিনোম সিকোয়েন্সও বের করে ফেলেছেন। অদূর ভবিষ্যতে পাটের উচ্চফলনশীল কিছু নতুন প্রজাতি উদ্ভাবিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যেগুলো লবণাক্ত জমিতে জন্মাতে এবং অল্প পানিতে পচতে সক্ষম।

৭. ভবিষ্যতে উচ্চমান সম্পন্ন দেশি পাট দিয়ে গার্মেন্টস শিল্পের সুতা উৎপাদন করাও সম্ভব হবে। ক্ষতিকর কীটদের নাড়ি-নক্ষত্র জানায় তারাও হয়তো আর সুবিধা করে উঠতে পারবে না। 'বিনা' এবং 'বিজেআরআই'র বিজ্ঞানীগণ এ সংক্রান্ত গবেষণার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে চলছেন।

৮. পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টর (জেডিপিসি)। এরই মধ্যে ২৩৫ ধরনের দৃষ্টিনন্দন বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনও হচ্ছে। এছাড়া পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প সোনালি ব্যাগ', ভিসকস, কম্পোজিট জুট টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস, চারকোল, পাট পাতার পানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে পাট শিল্পের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে কাজ করছে।

৯. পাটপণ্যকে উৎসাহিত করতে ৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

১০. বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১ ট্রিলিয়ন পলিথিন ব্যবহার করা হয় যা পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। তাই বর্তমানে পরিবেশ সচেতনতার জন্য আবারও এ সম্ভাবনাময় পাঠ শিল্পের পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে।

১১. আমাদের দেশের উন্নত পাট এখন বিশ্বের অনেক দেশে গাড়ি নির্মাণ, কম্পিউটারের বডি, উড়োজাহাজের পার্টস তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া ইনস্যুলেশন, ইলেকট্রনিক্স, মেরিন ও স্পোর্টস শিল্পেও বহির্বিশ্বে বেশ পরিচিত বাংলাদেশের পাট।

১২. পরিবেশবান্ধব ও যথাযথ উপযোগীতার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা খাদ্যশস্য মোড়কীকরণে পাটের থলে ও বস্তা ব্যবহারের সুপারিশ করেছে। বর্তমান বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৫০০ বিলিয়ন পাটের ব্যাগের চাহিদা রয়েছে। পরিবেশ সচেতনতার জন্য এ চাহিদা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

১৩. পাটের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আগামী ৫ বছর এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে বাংলাদেশের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন করে আবারো পাটশিল্প আমাদের রপ্তানি খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সুদূর প্রাচীনকাল থেকে আমাদের পাট শিল্প ছিল অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। আজও এদেশের লক্ষ লক্ষ কৃষকের অবলম্বন এই পাট। কর্মসংস্থান, অর্থ উপার্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সর্বোপরি এ দেশের ঐতিহ্য ও নিজস্বতা রক্ষায় পাট শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আধুনিকতার পদতলে নিষ্পেষিত যখন পুরো পৃথিবী, দূষণের ফলে বিশ্ব পরিবেশ যখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে, তখন পাট শিল্পের যথাযথ ব্যবহার আমাদের বাঁচাতে পারে অদূর ভবিষ্যতের অনেক ভয়াবহতা থেকে। তাই সরকারের সজাগ দৃষ্টি ও কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার করতে হবে আমাদের এ শিল্পকে এবং ফিরিয়ে আনতে হবে আমাদের হারানো অতীতের গৌরবান্বিত ঐতিহ্য।

■ **السؤال (٦)** : بين مساهمة الشيخ شاه جلال اليمانى (رح) فى نشر الإسلام ببنغلاديش.

■ প্রশ্ন : ৬ ॥ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে হজরত শাহজালাল ইয়ামেনী (র)-এর অবদান বর্ণনা কর।

উত্তর ।। **ভূমিকা :** বাংলায় পীর আউলিয়ারা ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অনেক পূর্ব থেকেই আগমন করেছিলেন। এ সময় বহু সুফিসাধক, আলেম ও আউলিয়া এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে তোলেন 'খানকাহ', যা ছিল আধ্যাত্মিক, মানবকল্যাণ ও বুদ্ধিভিত্তিক কার্যাবলির একটি প্রধান কেন্দ্র। যেসব অলী, আউলিয়া দিশেহারা মানুষকে সত্য, আলো ও শান্তির পথ দেখিয়েছেন, তাদের মধ্যে হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (র)-এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিচে ইসলাম প্রচারে তাঁর অনবদ্য অবদান আলোচনা করা হলো।

➲ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে হযরত শাহজালাল (র)-এর অবদান

১. **হযরত শাহজালাল (র)-এর পরিচয় :** হযরত শাহজালাল (র)-এর পুরো নাম শেখ শাহজালাল কুনিয়াত মুজাররদ। তাঁর জন্মসাল ও জন্মস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকের মতে তিনি ২৫ মে ১২৭১ খ্রিস্টাব্দে (৬৭১ হিজরী) জন্মগ্রহণ করেন। (সূত্র : উইকিপিডিয়া) কেউ তাঁকে ইয়ামানের অধিবাসী আবার কেউ কেউ তাঁকে কুনিয়ার অধিবাসী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯) উৎকীর্ণ দুটি শিলালিপি থেকে হযরত শাহজালাল (র)-এর পিতার নাম 'মুহাম্মদ' বলে তথ্য পাওয়া গেলেও তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে সেখানে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে জেমস ওয়াইজ কর্তৃক আবিষ্কৃত শিলালিপির বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে হযরত শাহজালাল (র)-এর জন্ম যে কুনিয়াতে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। গুলজার-ই-আবরার গ্রন্থে হযরত শাহজালাল (র)-এর জন্মস্থান সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায়, জেমস ওয়াইজের আবিষ্কৃত শিলালিপির বর্ণনা তার সাথে মিলে যাওয়ায় হযরত শাহজালাল (র) যে কুনিয়াতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেটি প্রমাণিত হয়। কুনিয়া তুরস্কের অন্তর্গত এশিয়া মাইনরে অবস্থিত ছিল। হযরত শাহজালাল (র)-এর জন্মের তিন মাস পর তাঁর মা ইন্তেকাল করেন। এর কিছু দিন পর তাঁর পিতাও যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। ফলে তিনি মামা সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দি (র)-এর নিকট লালিত-পালিত হন। আহমদ কবির (র) ছিলেন শ্রেষ্ঠ সাধক হযরত মাখদুম জাহানিয়া জাহাগস্ত (র)-এর পিতা এবং সৈয়দ জালালুদ্দিন বোখারী (র)-এর পিতা এবং সৈয়দ জালালুদ্দিন বোখারী (র)-এর পুত্রও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। ফলে মামার তত্ত্বাবধানে হযরত শাহজালাল (র)ও তাঁর মতো সাধকে পরিণত হন। পরিণত বয়সে হযরত শাহজালাল (র) তুর্কিস্তান, ইয়ামান, বাগদাদ ভ্রমণ শেষ করে ভারতবর্ষে এসে হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া (র)-এর সান্নিধ্য লাভ করেন। অতঃপর তিনি বাংলায় আগমন করে ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত হন।

২. **ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ :** শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে (১৩০১-১৩২২) হযরত শাহজালাল (র) বাংলায় আগমন করেন। তখন বাংলার সিলেট অঞ্চলে রাজা গৌর গোবিন্দ নামক একজন প্রতাপশালী হিন্দু রাজার শাসন চলছিল। তাঁর রাজত্বকালে বুরহানুদ্দিন নামক জনৈক মুসলিম তার শিশুপুত্রের জন্মকে কেন্দ্র করে গরু জবাই করলে রাজা গৌর গোবিন্দ এর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি হিসেবে বুরহানুদ্দিনের একটি হাত কেটে নেয় এবং তার শিশুপুত্রকে হত্যা করে। বুরহানুদ্দিন তৎকালীন গৌড়ের মুসলিম শাসকের নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ জানালে সিকান্দার শাহের নেতৃত্বে একটি বিশাল বাহিনী রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু এ বাহিনী রাজা গৌর গোবিন্দকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে আরেকটি বাহিনী প্রেরিত হলে হযরত শাহজালাল (র) তাঁর ৩৬০ জন অনুচরসহ রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলে হযরত শাহজালাল (র) অত্র অঞ্চলে ইসলামের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

৩. **খানকা প্রতিষ্ঠা :** সিলেট জয়ের পর এ অঞ্চলে খানকা স্থাপন করে হযরত শাহজালাল (র) পথহারা মানুষদের পথের দিশা দেওয়ার কাজে মনোনিবেশ করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে তাঁর শিষ্যগণ সাহায্য করেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে উক্ত এলাকায় ইসলামের বিকাশ ঘটতে থাকে।

৪. **সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকার দীক্ষা দান :** সুফি তরিকাসমূহের মধ্যে বিশেষ একটি তরিকা হলো সুহরাওয়ার্দিয়া তরিকা। এ তরিকার একজন খ্যাতনামা সাধক ছিলেন হযরত শাহজালাল (র)। তিনি এ তরিকায় বাংলার নব দীক্ষিত মুসলিমদেরকে দীক্ষিত করে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তাদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

৫. **ইসলামের বিকাশে সম্প্রসারিত কর্মকাণ্ড :** হযরত শাহজালাল (র) ক্রমান্বয়ে ইসলামের বিকাশমূলক কর্মকাণ্ডকে ভারতবর্ষে সম্প্রসারিত করেন। সিলেট ও আসাম অঞ্চলে তাঁর শিষ্যগণ ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের শাশ্বত বাণী প্রচার করতে থাকেন। ফলে বহু অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে নিজেদের ইহকালীন কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়।

৬. **ইবনে বতুতার বর্ণনায় শাহজালাল (র)-এর ইসলাম প্রচার :** ১৩৪৬ সালে হযরত শাহজালাল (র)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে মরক্কোর বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বঙ্গদেশে আগমন করেছিলেন। তিনি হযরত শাহজালাল (র)-এর আল্লাহভীতি ও ইসলামের বিকাশে তাঁর অবদানের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। ইবনে বতুতা বলেন, হযরত শাহজালাল (র) একটি গুহার মধ্যে সারারাত ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তাঁর খানকা লোকালয় থেকে দূরে গুহার বাইরে ছিল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং সূর্য উপাসক সম্প্রদায়ের লোকজন তার দর্শনার্থে খানকায় আসতেন।

৭. **ইন্তেকাল :** হযরত শাহজালাল (র) একাধারে একজন যোদ্ধা, সমাজসেবী ও উচ্চ মার্গের তাপস ছিলেন। জীবনের শেষ দিনগুলো তিনি আল্লাহর ধ্যানে গুহার মধ্যে অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি ১৩৪১ সালে ইন্তেকাল করেন। (সূত্র : উইকিপিডিয়া)

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, এদেশের জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে হযরত শাহজালাল (র) অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিকতা, ইসলাম ও মানবতার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ভারতবর্ষের প্রধানত বাংলা ও আসামের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। যার কারণে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়। এ দেশের ইসলাম প্রিয় মানুষ এ মহান সাধককে আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

مجموعة (ب)

(ب) **অংশ**

الدرجات : ٥ × ٤ = ٢٠ [মান– ৫ × ৪ = ২০]

■ **السؤال (٧) :** تحدث عن دور صناعة الملابس الجاهزة فى التنمية الاقتصادية لبنغلاديش باختصار.

■ **প্রশ্ন : ৭ ॥ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক শিল্পের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোকপাত কর।**

উত্তর ॥ **ভূমিকা :** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক শিল্পের ভূমিকা অনেক। এদেশে প্রচুর কাঁচামাল, প্রাকৃতিক সম্পদ, সুলভ শ্রমিক ইত্যাদি কারণে শিল্পোন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। তৈরি পোশাক শিল্প একটি সম্ভাবনাময় শিল্প। এ শিল্প খুব দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। অন্য কোনো শিল্প এ শিল্পের মতো এত দ্রুত বিকাশ লাভ করেনি। তাই তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক তাৎপর্যময় অধ্যায়।

➲ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক শিল্পের ভূমিকা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক শিল্পের ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরি পোশাক শিল্পের ভূমিকা :** বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সর্ববৃহৎ উৎস হলো তৈরি পোশাক শিল্প। বর্তমানে মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮১ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার দ্রব্যাদি রপ্তানি থেকে।

২. **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :** বাংলাদেশ একটি জনবহুল ও শ্রমঘন দেশ। আমাদের রয়েছে বিশাল শ্রমশক্তি। তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ বাংলাদেশের বেকার জনশক্তি, বিশেষ করে অদক্ষ ও অশিক্ষিত নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এক সমীক্ষায় পাওয়া তথ্য মতে, এ শিল্পে প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত রয়েছে। আর পরোক্ষভাবে প্রায় ২ কোটি লোক এ শিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

৩. **দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা :** তৈরি পোশাক শিল্প বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের উপার্জন বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখছে। এর ফলে এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট প্রায় ২ কোটি জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশে দারিদ্র্য বিমোচনে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৪. **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি :** দেশের শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভোগ্যপণ্য আমদানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে গেলে দেশে শিল্পের বিকাশ, বৈদেশিক ঋণের দায় শোধ ও নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগপণ্য আমদানি ব্যাহত হয়, যা দেশকে অর্থনৈতিক সংকটের দিকে ঠেলে দিতে পারে। তৈরি পোশাক শিল্পের বিপুল রপ্তানি আয় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার পর্যাপ্ত রিজার্ভ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৫. **ব্যাংক-বিমা ব্যবসার সম্প্রসারণ :** তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ পোশাক রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সহায়ক আর্থিক খাতের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছে। এসব সহায়ক খাতের মধ্যে ব্যাংক ও বিমা খাত উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ফ্রেইড ব্যবসায়, ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্টের কাজও বেড়েছে। ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ বিনিয়োগ বেড়েছে, যা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, তৈরি পোশাক শিল্প হচ্ছে বাংলাদেশের অতি সম্ভাবনাময় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী দ্রুত বিকশিত শিল্প। এ শিল্পের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অর্থনীতির বিরাট এক অংশ। দেশের নিরক্ষর ও স্বল্পশিক্ষিত জনবল, বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে তৈরি পোশাক শিল্প অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আর এ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীদের আয় বৃদ্ধির ফলে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে ব্যাংক-বিমা, ওষুধ শিল্প, প্রসাধন শিল্পসহ আরো অনেক ক্ষুদ্র শিল্পে। তাই বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম।

■ **السؤال (٨)** : اذكر أبرز انجازات الحكومة فى حقل النقل البرى موجزا ـ

■ প্রশ্ন : ৮ ॥ সড়ক ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

উত্তর।। **ভূমিকা :** একটি দেশের উন্নতির পূর্বশর্ত হচ্ছে উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সড়কপথের গুরুত্ব অপরিসীম। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য সড়কপথই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এমন অনেক স্থান আছে যেখানে রেলপথ বা জলপথ নাই। এ সকল স্থানে সড়কপথই একমাত্র অবস্থান।

➲ সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

নিচে সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ আলোচনা করা হলো–

১. **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ :** সরকার দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৮৪২টি সেতু এবং ৩ হাজার ৫৪৬টি কালভার্ট নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ করেছে। দশম জাতীয় সংসদের ২২তম অধিবেশনে সেতুমন্ত্রী এসব তথ্য জানান।

২. **আঞ্চলিক ও বিশ্ব সড়ক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা :** রাজধানীর অর্থনীতি আরও বেগবান ও ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো। তাই যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৬১ হাজার ৪৫৫ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে। এখাতে গত অর্থবছরে প্রস্তাবিত বাজেট ছিল ৫৩ হাজার ৮১ কোটি টাকা। বাজেটে যোগাযোগ খাতের টেকসই ও নিরাপদ সড়ক, মহাসড়ক উন্নয়ন, সেতু, টানেল নির্মাণ ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩. **টেকসই ও নিরাপদ সড়ক-মহাসড়ক উন্নয়ন :** ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে সড়ক উন্নয়ন ও সংস্কার, নতুন সড়ক নির্মাণ, উড়াল সেতু, ওভারপাস নির্মাণ, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদি জনগুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে সকল জাতীয় মহাসড়ককে চার বা তার চেয়ে বেশি লেনে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৫০৯ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক চার বা তার চেয়ে বেশি লেনে উন্নীত করা হয়েছে।

৪. **প্রধান প্রধান সড়কসমূহের উন্নয়ন :** বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দেশের বিভিন্ন জেলা ও বন্দরের যোগাযোগ রক্ষাকারী অনেকগুলো সড়ক রয়েছে। এর মধ্যে মহানগরী ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল প্রভৃতি শহরের যোগাযোগ রক্ষাকারী সড়কসমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে টেকসই মহাসড়ক অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং পরিবহণ সেবা ও ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. **প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা :** জাতীয় মহাসড়কের দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান চিহ্নিত করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং 'আট হাজার একশ' স্পটে ডাইরেকশনাল সাইন সিগন্যাল ও কিলোমিটার পোস্ট স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশে সরকারের আধুনিক নগর পরিবহণ ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অর্জন।

এছাড়াও বর্তমান সরকারের যোগাযোগ ব্যবস্থায় অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প হিসেবে বিশেষ উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। সরকারের এই মেগা প্রকল্পগুলো হচ্ছে–

ক. জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল এলেঙ্গা সড়ক ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ।
খ. দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হয়ে ঘুমধুম পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্প।
গ. কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প।
ঘ. রংপুর মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ।
ঙ. ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী থেকে মাওয়া পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে আধুনিক, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যে সরকার যোগাযোগ অবকাঠামোতে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

■ **السؤال (٩)** : بين الموقع الجغرافى والحدود لدولة بنغلاديش ـ

■ প্রশ্ন : ৯ ॥ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমানার বর্ণনা দাও।

উত্তর।। **ভূমিকা :** অপূর্ব নান্দনিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ আমাদের এ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের জনগণের ইতিহাস একদিকে যেমন গৌরবময় অন্যদিকে তেমনি বৈচিত্র্যময়। বাঙালি জাতির রয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তা, রয়েছে স্বকীয় ইতিহাস। আমাদের এ বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ হিসেবে পরিচিত।

➲ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান

ভৌগোলিক বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায়, ভারত ও মিয়ানমারের মাঝখানে। আয়তনের দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ৯০ তম। বাংলাদেশ ২০°৩৪´ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮´ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৮°০১´ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে ৯২°৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের মাঝখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩°৫´ উত্তর অক্ষরেখা) অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশের পশ্চিম, উত্তর, আর পূর্ব জুড়ে রয়েছে ভারত। পশ্চিমে রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়

রাজ্য। পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম। তবে পূর্বে ভারত ছাড়াও মিয়ানমারের (বার্মা) সাথে সীমান্ত রয়েছে। দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা সমুদ্র সমতল হতে মাত্র ১০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। সমুদ্র সমতল মাত্র ১ মিটার বৃদ্ধি পেলেই এদেশের ১০% এলাকা নিমজ্জিত হবে বলে ধারণা করা হয়। বঙ্গোপসাগর উপকূলে অনেকটা অংশ জুড়ে সুন্দরবন অবস্থিত, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে ৬টি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস। এখানকার আবহাওয়াতে নিরক্ষীয় প্রভাব দেখা যায়।

➲ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা

ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মিয়ানমার এবং বঙ্গোপসাগরের সীমানা আছে। বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল এবং সর্বমোট সীমারেখা ৫,১৩৮ কিলোমিটার। স্থলভাগের সীমারেখা ৪,৪২৭ কিলোমিটার; উপকূলের দৈর্ঘ্য ৭১১ কিলোমিটার। অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল বা ৩৭০.৪ কিলোমিটার; রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৪,১৫৬ কিলোমিটার এবং মিয়ানমারের সাথে ২৭১ কিলোমিটার। বাংলাদেশের সীমানার সাথে ভারতের ৫টি রাজ্য রয়েছে। যথা : আসাম, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গ। মিয়ানমারের ২টি প্রদেশ রয়েছে। যথা : চিন ও রাখাইন। বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা ৩২টি। ভারতের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা ৩০টি। মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা ৩টি। যথা : কক্সবাজার, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি। ভারত ও মিয়ানমার উভয় দেশের সীমান্তবর্তী বাংলাদেশের জেলা ১টি। যথা : রাঙ্গামাটি।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এদেশের তিনদিকে স্থল ও একদিকে জল। এর সীমানা পরিচিতি লক্ষ করলে দেখা যায়, পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মীয় দেশ আমাদের এ বাংলাদেশ। এ দেশের তিনদিকে ভারত এবং একদিকে মিয়ানমার ও বঙ্গোপসাগর; যা অন্যকোনো দেশের সীমানায় লক্ষ করা যায় না।

■ **السؤال (١٠)** : بين تاريخ المدرسة العالية الحكومية بداكا بإيجاز.

■ **প্রশ্ন : ১০ ॥ সরকারি মাদরাসা-ই আলিয়া-ঢাকা এর ইতিহাস বর্ণনা কর।**

উত্তর ॥ **ভূমিকা :** সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী আলিয়া মাদরাসা যা ঢাকা আলিয়া নামে অধিক খ্যাত। ১৭৮০ সালে বাংলার ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতায় কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলে আলিয়া মাদরাসা কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ঢাকায় আলিয়া মাদরাসার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন খান বাহাদুর মাওলানা জিয়াউল হক।

➲ সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা এর ইতিহাস

আলিয়া মাদরাসা, ঢাকা (মাদরাসা-ই-আলিয়া) দাপ্তরিকভাবে মাদরাসা-ই-আলিয়া নামে পরিচিত। ১৭৮০ সালে বাংলার ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৮১ থেকে ১৮১৯ সাল পর্যন্ত আলিয়া মাদরাসা 'বোর্ড অব গভর্নরস' দ্বারা এবং ১৮১৯ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ইংরেজ সেক্রেটারি ও মুসলমান সহকারী সেক্রেটারির অধীনে 'বোর্ড অব গভর্নরস' দ্বারা পরিচালিত হয়। ১৮৫০ সালে আলিয়া মাদরাসায় অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হলে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজ কর্মকর্তাগণ এ পদ অলংকৃত করেন। ১৮২৯ সালে আলিয়া মাদরাসায় ইংরেজি বিভাগ খোলা হয়। ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩৪ বছরে এ বিভাগে ১৭৮৭ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করেন। ১৮৫৪ সালে মাদরাসায় একটি পৃথক ইনস্টিটিউট হিসেবে ইঙ্গ-ফারসি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ভর্তির সময় শরাফতনামা (উচ্চ বংশে জন্মের সনদপত্র)-এর উপর জোর দেওয়া হতো। ইংরেজি এবং ফারসি ভাষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ইঙ্গ-ফারসি বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তোলা। ইঙ্গ-ফারসি বিভাগ মুসলিম অভিজাতদের মধ্যে তেমন আগ্রহ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। ১৮২১ সালে মাদরাসার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মাদরাসায় প্রথাগত পরীক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৮৫৪ সালের শিক্ষাসংক্রান্ত 'ডেস্পাচ'-এ কলকাতা মাদরাসাকে প্রস্তাবিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে আসার ইঙ্গিত থাকলেও মাদরাসাটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনা হয়নি। ১৮৬৩ সালে কলকাতা মাদরাসায় এফ.এ পর্যায়ের ক্লাস সংযোজিত হয়। ১৯০৭ সালে মাদরাসায় তিন বছর মেয়াদি কামিল কোর্স চালু হয়। ১৯৪৭ সালে আলিয়া মাদরাসা কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয় এবং নামকরণ করা হয় মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা। ১৯৬০ সালে মাদরাসা লক্ষ্মীবাজার থেকে বকশীবাজারে স্থানান্তরিত হয়। ঢাকা আলিয়া মাদরাসার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন খান বাহাদুর মাওলানা জিয়াউল হক। বর্তমানে মাদরাসায় প্রায় ১৫০০ শিক্ষার্থী ও ৫০ জন শিক্ষক রয়েছেন (সূত্র উইকিপিডিয়া)। মাদরাসাটির রয়েছে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, কম্পিউটার ল্যাব, খেলারমাঠ এবং ছাত্রাবাস। ২০০৬ সালে ঢাকা আলিয়া মাদরাসা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের অধিভুক্ত হয়। ২০১৬ সালে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে যায়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা আলিয়া মাদরাসা ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর ঢাকার বকশীবাজারে স্থানান্তরিত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশেও এ মাদরাসা ইসলামি শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে চলেছে।

■ **السؤال (١١)** : بين القبائل والشعوب الأصلية لبنغلاديش.

■ প্রশ্ন : ১১ ॥ বাংলাদেশের উপজাতি ও আদিবাসী সম্পর্কে ধারণা দাও।

উত্তর ।। **ভূমিকা :** বাংলাদেশে কারা উপজাতি ও কারা আদিবাসী এ নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। তবে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে এ বিতর্কের অবসান ঘটানো হয়েছে। সংবিধানে কোনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। তাই বাংলাদেশের পাহাড়ে বা সমতলে বসবাসরত সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী উপজাতি হিসেবে গণ্য হয়।

➲ বাংলাদেশের উপজাতি

উপজাতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Tribe। এটা উপনিবেশিক শব্দ। উপজাতি বলতে এমন জনগোষ্ঠীগুলোকে বুঝায় যারা আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি; কিন্তু নিজস্ব একটি আলাদা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। মূলত রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে জাতি বা উপজাতি নির্দিষ্টকরণ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে বাঙালি মূলধারার বাইরে যারা আছে, তারাই উপজাতি হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশে উপজাতি জনগোষ্ঠীসমূহ হচ্ছে- চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মগ, মুরং, হাজং ইত্যাদি। বাংলাদেশে উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর শীর্ষস্থানে রয়েছে চাকমা উপজাতির লোকজন। মূলত ১৬০০ সালের পর থেকে তারা এ দেশে আসতে শুরু করে। একেক উপজাতিদের জন্য এ দেশে আগমনের কারণ ছিল একেক রকম। কেউ বিতাড়িত হয়ে, কেউ প্রাণের ভয়ে, কেউবা শুধুমাত্র শখের বশে এ দেশে এসে বসবাস করছে। উপজাতিরা বেশিরভাগই আমাদের দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে বসবাস করে।

➲ বাংলাদেশের আদিবাসী

আভিধানিক ও নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞা অনুযায়ী আদিবাসী মানে আদিবাসিন্দা। আদিবাসী শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Indigenous people। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ মর্গানের সংজ্ঞানুযায়ী আদিবাসী হচ্ছে, "কোনো স্থানে স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাসকারী আদিমতম জনগোষ্ঠী, যাদের উৎপত্তি, ছড়িয়ে পড়া এবং বসতি স্থাপন সম্পর্কে বিশেষ কোনো ইতিহাস জানা নেই।" আক্ষরিক অর্থে ও আভিধানিক সংজ্ঞানুসারে কোনো দেশ বা স্থানের আদিম অধিবাসী বা অতিপ্রাচীনকাল থেকে বসবাসরত জনগোষ্ঠীই ওই অঞ্চলের আদিবাসী। সেই অর্থে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে বসবাসরত বাঙালিরাই এদেশের আদিবাসী। বর্তমানে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডে বিভিন্ন সময়ে আগত অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের অধিবাসী বটে, আদিবাসী নয়। কেননা বাঙালিরা বাংলাদেশে সবার আগে থেকে বসবাস করছে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আদিবাসীদের উপজাতি হিসেবে সম্বোধন করা একেবারেই অনুচিত। কারণ তারা কোনো জাতির অংশ নয় যে তাদের উপজাতি বলা যাবে; বরং তারা নিজেরাই এক একটি আলাদা জাতি। যেমন, বাংলাদেশের বাঙালিরা আলাদা একটি জাতি, তাই তারা বাংলাদেশের আদিবাসী। আর অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক ক্ষুদ্রজনগোষ্ঠী হচ্ছে বাংলাদেশের উপজাতি।

■ **السؤال (١٢)** : عرف بعض الأنهار المشهورة فى بنغلاديش.

■ প্রশ্ন : ১২ ॥ বাংলাদেশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নদীর পরিচয় দাও।

উত্তর ।। **ভূমিকা :** বাংলাদেশের গর্ব নদীনালা। এখানে প্রায় ৭০০টি নদী-উপনদী সমন্বয়ে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নদীব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে। বাংলাদেশের নদ-নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪,১৪০ কি.মি.। বাংলাদেশের নদীনালাগুলো স্বাভাবিকভাবেই দেশের সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নয়। দেশের উত্তরভাগের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণভাগের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে নদ-নদীর সংখ্যা এবং আকার দু-ই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

➲ বাংলাদেশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নদীর পরিচয়

নিচে বাংলাদেশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নদীর পরিচয় দেওয়া হলো–

১. **পদ্মা :** পদ্মা বাংলাদেশের একটি প্রধান নদী। এটি হিমালয়ে উৎপন্ন গঙ্গানদীর প্রধান শাখা এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপন্ন গঙ্গা নদীর প্রধান শাখা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলা (মানাকোসা ও দুর্লভপুর ইউনিয়ন) দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এখান থেকে নদীটি পদ্মা নাম ধারণ করেছে। বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর রাজশাহী এ পদ্মার উত্তর তীরে অবস্থিত। বাংলাদেশে নদীটির দৈর্ঘ্য ১২০ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ১০ কিলোমিটার। রাজা রাজবল্লভের কীর্তি পদ্মার ভাঙনের মুখে পড়ে ধ্বংস হয় বলে পদ্মার আরেক নাম কীর্তিনাশা। পদ্মা ইলিশ মাছের জন্য বিখ্যাত।

২. **মেঘনা :** মেঘনা বাংলাদেশের গভীরতম ও প্রশস্ততম নদী এবং অন্যতম বৃহৎ ও প্রধান নদী। নদীটির দৈর্ঘ্য ১৫৬ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৩৪০০ মিটার এবং নদীটির প্রকৃতি সর্পিলাকার। মেঘনা নদী দুটি অংশে বিভক্ত। কুলিয়ারচর থেকে ষাটনল পর্যন্ত 'আপার মেঘনা'। নদীর এই অংশ অপেক্ষাকৃত ছোট। ষাটনল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অংশ লোয়ার মেঘনা' নামে পরিচিত। এ অংশে নদী বিশাল এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ মোহনার অধিকারী।

৩. **যমুনা :** যমুনা নদী আমাদের দেশের উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত সবচেয়ে প্রশস্ত নদী। ময়মনসিংহের দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের এক শাখা যমুনা নামে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। বর্ষাতে এর প্রবাহ অনেক বেশি থাকে। যমুনা যেমন জলরাশি প্রবাহ করে তেমনি পলিরাশিও প্রবাহ করে। বর্ষায় যমুনা নদী প্রতিদিন প্রায় ১২ লক্ষ টন পলি বহন করে। যমুনা নদীর চারটি উপনদী হলো দুধকুমার, তিস্তা, করতোয়া-আত্রাই, ধরলা।

৪. **ব্রহ্মপুত্র :** ব্রহ্মপুত্র এশিয়া মহাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। সংস্কৃত ভাষায় ব্রহ্মপুত্রের অর্থ হচ্ছে "ব্রহ্মার পুত্র"। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব নাম ছিল লৌহিত্য। আবার তিব্বতে তা জাঙপো নামে পরিচিত এবং আসামে তার নাম দিহাঙ। ব্রহ্মপুত্র হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের নিকটে মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে তিব্বত ও আসামের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রামের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এটিই বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করেছে।

৫. **কর্ণফুলি :** কর্ণফুলি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের একটি প্রধান নদী। এই নদীর মোহনাতে বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বন্দর অবস্থিত। কর্ণফুলি নদীর দৈর্ঘ্য ৩২০ কিলোমিটার। তবে বাংলাদেশ অংশের দৈর্ঘ্য ১৬১ কিলোমিটার। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে কর্ণফুলি নদীর উপর বাঁধ দিয়ে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

৬. **তিস্তা :** তিস্তা সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি বিভাগের প্রধান নদী। এটি নীলফামারী জেলার কালীগঞ্জ সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তিস্তা নদীর সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৩১৫ কি. মি.। তার মধ্যে ১১৫ কি. মি. বাংলাদেশ ভূখন্ডে অবস্থিত।

৭. **বুড়িগঙ্গা :** বুড়িগঙ্গা নদী ঢাকা শহরের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে দিয়ে প্রবাহিত জোয়ার ভাটা প্রভাবিত একটি নদী। সাভারের দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদী থেকে বুড়িগঙ্গা নদীর উদ্ভব। নদীটির গড় গভীরতা ও প্রশস্ততা যথাক্রমে ১০ মিটার ও ৪০০ মিটার এবং মোট দৈর্ঘ্য ২৭ কিলোমিটার। বুড়িগঙ্গার ভাটি অঞ্চল সারাবছরই নাব্য থাকে। ঢাকা শহরের জন্য বুড়িগঙ্গা নদী অর্থনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। নদীকে ঘিরেই বাংলাদেশের শহর, বন্দর, গঞ্জ, বাজার প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। নদী ও বাংলাদেশ একই সুতোয় গাঁথা দুটি নাম। নদী বাংলাদেশকে করেছে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা। তাই ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম।

■ **السؤال (١٣) :** اكتب فقرة وجيزة حول الكثافة السكانية فى بنغلاديش -

■ **প্রশ্ন : ১৩ ॥ বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লেখ।**

উত্তর ॥ ভূমিকা : অর্থনৈতিক উন্নয়ন জনসংখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়, আবার জনসংখ্যাও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর উভয় বিষয়ই জনসংখ্যার ঘনত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি দেশে প্রতি বর্গমাইল বা প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে যে পরিমাণ মানুষ বসবাস করে, তাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে। একটি দেশের মোট জনসংখ্যাকে মোট আয়তন দ্বারা ভাগ করলে জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়। বিশ্বের অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি।

➲ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ঘনত্ব

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে জনসংখ্যার ঘনত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৭৪ সালে এদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৪৯৭ জন এবং ২০১১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০১৫ জন। এর থেকে বলা যায়, বাংলাদেশে ৩৭ বছরে জনসংখ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যধিক হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. অনুকূল জলবায়ু; ২. অতি সহজে চাষ করা যায় এমন বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল; ৩. নাতিশীতোষ্ণ ও মৃদুভাবাপন্ন জলবায়ু; ৪. উর্বর ভূমি; ৫. প্রচুর বৃষ্টিপাত; ৬ একান্নবর্তী পরিবারের আধিক্য; ৭. মৃত্যুহারের তুলনায় অধিক জন্মহার; ৮. নিম্ন জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি।

জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ :

$$DP = \frac{TP}{TA}$$

যেখানে, DP = জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population),
TP = মোট জনসংখ্যা (Total Population),
TA = মোট আয়তন (Total Area).

সূত্রটি প্রয়োগ করে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে।

যেমন– ২০১১ এর আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩ শত ৬৪ জন এবং বাংলাদেশের মোট ভৌগোলিক আয়তন হলো ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এবার এ উপাত্ত জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্রে উপস্থাপন করি,

$$\text{জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population)} = \frac{১৪,৯৭,৭২৩৬৪}{১৪৭,৫৭০} = ১০১৪.৯২ = ১০১৫ \text{ জন (প্রায়)}$$

অর্থাৎ, ২০১১ এর হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব হলো ১০১৫ (প্রায়) বা বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটার ১০১৫ জন লোক বসবাস করে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, যেকোনো দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভর একদিকে যেমন জনসংখ্যা পরিমাণের উপর অপরদিকে তেমনি দেশের ভৌগোলিক আয়তনের উপরও। বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর এ ঘনবসতির অন্যতম কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি কিন্তু সেই তুলনায় আয়তন অনেক কম।